ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 75-90
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.436

জাত ও লিঙ্গের বাধা পেরিয়ে: প্রান্তিক তপশিলি জাতি নারীর পরিবার ও সমাজে অগ্রগতির পথ

চণ্ডী চরণ লেট, *গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The lives of marginalized Scheduled Caste women in Indian society have long been shaped by various forms of discrimination. On the one hand, they face gender-based discrimination as women; on the other, they encounter caste-based discrimination due to their Dalit identity. In addition, poverty imposes further limitations on their lives. As a result, for many years, their access to education, employment opportunities, and active participation in society remained extremely restricted.

However, this picture has gradually begun to change. Today, many marginalized Scheduled Caste women are pursuing education, striving to become self-reliant, and becoming aware of their rights. This transformation is not limited to their personal lives—it is also impacting their families and the next generation. An educated mother, for instance, understands the importance of education for her children and can raise them with greater confidence.

With economic independence, these women are now able to participate in important family decisions. Where their opinions were once largely ignored, their presence is now becoming visible. Similarly, by participating in panchayats and local meetings, they are challenging long-standing caste and gender-based barriers in society.

These changes may not always be immediately visible, but a significant transformation is occurring beneath the surface. It can be described as a kind of "silent revolution," where women are gradually carving out their own space. This progress among marginalized Scheduled Caste women is not only important for them individually but is also crucial for the future development of families and society.

Keywords: Marginalized Scheduled Caste women, gender and caste discrimination, education and social progress, economic independence, social awareness, silent revolution

ভারতীয় সমাজে 'জাত' এবং 'লিঙ্গ' বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে একটি গভীর ও জটিল বাস্তবতা হিসেবে বিদ্যমান। এখানে নারীরা শুধু নারী হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জাতিগত পরিচয়ও তাদের জীবনের সুযোগ-সুবিধাকে নির্ধারণ করে। এই দুই ধরনের বৈষম্যের চাপ সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন প্রান্তিক তপশিলী নারীরা।

এই নারীদের জীবন অনেক সময়ই সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরিবার ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম, পুরুষকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং নানা সামাজিক বাধা তাদের স্বাধীনভাবে ভাবতে বা সিদ্ধান্ত নিতে

বাধা দেয়। তার ওপর, দলিত বা তপশিলী পরিচয়ের কারণে তারা সমাজে সমান মর্যাদা, শিক্ষা এবং কাজের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। দারিদ্র্য ও সীমিত আর্থিক সম্পদ এই সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাদের অনেক স্বপ্ন, শিক্ষা অর্জনের ইচ্ছা এবং স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ অপূর্ণই থেকে গেছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই নারীদের জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ খুবই কম ছিল। তাদের ভূমিকা প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল গৃহস্থালির কাজ, কৃষিকাজ বা দৈনন্দিন ছোটখাটো দায়িত্বের মধ্যে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং বর্ণভিত্তিক কঠোর নিয়মের কারণে তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে বা সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারতেন না। বাল্যবিবাহ, শিক্ষার অভাব এবং আর্থিক নির্ভরতা তাদের অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে বর্তমান সময়ে ধীরে ধীরে এই চিত্র বদলাচ্ছে। অনেক প্রান্তিক তপশিলী নারী এখন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হচ্ছেন এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন। এই পরিবর্তন শুধু তাদের নিজের জীবনেই নয়, তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজেও প্রভাব ফেলছে। তারা এখন আর শুধুই বঞ্চনার শিকার নন; বরং তারা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন এবং সমাজের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন।

এই পরিবর্তনকে সহজে চোখে ধরা না পড়লেও, এটি এক ধরনের গভীর সামাজিক রূপান্তর–একটি 'নীরব বিপ্লব'। এই বিপ্লবের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, কীভাবে প্রান্তিক তপশিলী নারীরা শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জীবন পরিবর্তন করছেন, তা বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি এটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তাদের এই অগ্রগতি কেবল ব্যক্তিগত নয়– এটি সমাজের পুরনো বৈষম্যমূলক কাঠামো ভেঙে একটি আরও ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রান্তিক তপশিলী নারীদের সংগ্রাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির গল্প নয়; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, যা ধীরে ধীরে সমাজকে আরও সমতা, ন্যায় এবং সচেতনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সমস্যা

ভারতের প্রান্তিক তপশিলী নারীরা একাধিক স্তরের বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করেন। তাদের অভিজ্ঞতা কেবল একটি নয়, বরং লিঙ্গ, জাত এবং শ্রেণিগত– এই তিনটি মাত্রায় গঠিত।

প্রথমত, লিঙ্গ বৈষম্য তাদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে সীমিত করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগ পান না।

দ্বিতীয়ত, জাতভিত্তিক বৈষম্য তাদের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাকে প্রভাবিত করে। দলিত বা তপশিলী পরিচয়ের কারণে তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

তৃতীয়ত, শ্রেণিগত বৈষম্য, অর্থাৎ দারিদ্র্য ও সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদ, তাদের জীবনের সম্ভাবনাকে আরও সংকুচিত করে।

এই প্রেক্ষাপটে মূল প্রশ্নটি হলো–

কীভাবে প্রান্তিক তপশিলী নারীরা এই বহুমাত্রিক বৈষম্য অতিক্রম করে পরিবার ও সমাজে নিজেদের অগ্রগতির পথ তৈরি করছেন?

উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো–

১. প্রান্তিক তপশিলী নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ ও প্রক্রিয়াগুলো চিহ্নিত করা।

২. শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক সচেতনতা কীভাবে তাদের অবস্থান ও ক্ষমতায়নকে প্রভাবিত করছে, তা বিশ্লেষণ করা।

৩. আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক কাঠামো–বিশেষত ইন্টারসেকশনালিটি (intersectionality)—এর আলোকে এবং ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর স্বায়ত্তশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার মূল্যায়ন করা।

৪. বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রান্তিক তপশিলী নারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা ধীর কিন্তু গভীর সামাজিক পরিবর্তন, অর্থাৎ একটি নীরব বিপ্লবের এর চিত্র উপস্থাপন করা।

অনুমান

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত অনুমানগুলো বিবেচনা করা হয়েছে–

১. প্রান্তিক তপশিলী নারীদের শিক্ষার স্তর যত বৃদ্ধি পায়, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পায়।

২. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নারীদের স্বায়ত্তশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।

৩. সামাজিক সচেতনতা ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি নারীদের বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আরও সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৪. জাত (caste), লিঙ্গ (gender) এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অভিজ্ঞতা, স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক অগ্রগতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৫. প্রান্তিক তপশিলী নারীদের জীবনে ধীরে ধীরে একটি ‘নীরব বিপ্লব’ গড়ে উঠছে, যা তাদের সামাজিক অবস্থান, ভূমিকা এবং আত্মপরিচয়ের পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

পদ্ধতি

এই প্রবন্ধটি গুণগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচিত। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধানত গৌণ উৎস, যেমন বিভিন্ন গবেষণাপত্র, বই এবং সরকারি রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রান্তিক তপশিলী নারীদের সামাজিক বাস্তবতা এবং অগ্রগতির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

ইতিহাস ও প্রেরণা

ভারতীয় সমাজে প্রান্তিক তপশিলী নারীদের বর্তমান অবস্থানকে বুঝতে হলে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে জাতপাত প্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর কারণে এই নারীরা শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। তাদের জীবন অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল গৃহস্থালির কাজ, কৃষিশ্রম এবং স্বল্প আয়ের নানা পেশায়। সমাজে তাদের মতামত খুব একটা গুরুত্ব পেত না, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তারা প্রায় উপেক্ষিত থাকতেন।

তবে এই দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসের মধ্যেই পরিবর্তনের বীজও রোপিত হয়েছে। কিছু মহান সমাজসংস্কারকের চিন্তা ও কর্ম প্রান্তিক মানুষের মধ্যে নতুন আশা, আত্মবিশ্বাস এবং সচেতনতার জন্ম দেয়। তাঁদের প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তনের পথকে সুগম করে।

আম্বেদকর প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন এবং শিক্ষা ও আইনি অধিকারের মাধ্যমে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। তাঁর বিখ্যাত আহ্বান– “Educate, Agitate, Organize”— প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত হওয়া, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সংগঠিতভাবে লড়াই করার প্রেরণা জোগায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোনো সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে সেই সমাজে নারীদের অবস্থানের উপর। তাই নারীর শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার এবং সামাজিক স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অন্যদিকে, সাবিত্রীবাই ফুলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অগ্রগামী পথিকৃৎ। তিনি ভারতের প্রথম দিকের মহিলা শিক্ষিকাদের একজন এবং মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। সেই সময় সমাজে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি প্রবল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই কাজ চালিয়ে যান। বিশেষ করে দলিত ও প্রান্তিক মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে তিনি সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগ নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাদের নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও কাজ প্রান্তিক তপশিলী নারীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁদের আদর্শ আজও নারীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, সামাজিক সচেতনতা এবং অধিকার অর্জনের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগায়। তাই বলা যায়, বর্তমান সময়ে প্রান্তিক নারীদের যে অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করি, তার পেছনে এই সমাজ সংস্কারকদের ঐতিহাসিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাত্ত্বিক কাঠামো

প্রান্তিক তপশিলী নারীদের জীবন, অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রামকে গভীরভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্বগুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, সমাজের ভেতরে থাকা বিভিন্ন স্তরের বৈষম্য কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারীদের জীবনে জটিল প্রভাব ফেলে।

প্রথমত, কিম্বার্লে ক্রেনশো প্রবর্তিত ইন্টারসেকশনালিটি (Intersectionality) ধারণাটি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন নারী কেবল লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার নন; বরং জাত (caste), শ্রেণি (class), ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি একাধিক সামাজিক পরিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে তিনি বহুমাত্রিক শোষণের সম্মুখীন হন। বিশেষত, একজন তপশিলী নারী একই সঙ্গে নারী, দলিত এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা একাধিক স্তরের বৈষম্যের দ্বারা নির্মিত। ফলে তাঁর অগ্রগতির পথ স্বাভাবিকভাবেই আরও কঠিন ও জটিল হয়ে ওঠে।

এই তত্ত্ব থেকে পরিস্ফুটিত হয় যে, প্রান্তিক নারীদের জীবনকে যদি কেবল একটি দৃষ্টিকোণ–যেমন শুধু লিঙ্গ বা শুধু শ্রেণি–থেকে বিচার করা হয়, তবে তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বরং তাদের অভিজ্ঞতাকে বোঝার জন্য একটি বহুমাত্রিক ও আন্তঃসম্পর্কিত বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায়বোধ এবং নারী-মুক্তি বিষয়ক চিন্তাধারা প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অবস্থান বিশ্লেষণে একটি মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর ‘ক্রমিক অসমতা’ (graded inequality) ধারণা অনুযায়ী, ভারতীয় সমাজে বৈষম্য কোনো একক নয়, বরং এটি স্তরবিন্যস্ত এবং পরস্পর-সংযুক্ত একটি কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যে তপশিলী নারীরা–যারা একযোগে জাত, লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার– সবচেয়ে নিচের স্তরে অবস্থান করেন।

আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল আইনগত অধিকার যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার এবং মানসিকতার পরিবর্তন। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের উপায় নয়, বরং ক্ষমতায়নের শক্তিশালী হাতিয়ার। এই চিন্তাধারা আজও প্রান্তিক নারীদের আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদা গড়ে তুলতে প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয়ত, উমা চক্রবর্তীর 'ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্র' (Brahmanical Patriarchy) ধারণাটি ব্যাখ্যা করে যে, জাতপাত প্রথা টিকিয়ে রাখতে নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ একটি সুসংগঠিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থায় 'জাতের শুদ্ধতা' বজায় রাখতে অন্তর্বিবাহ (endogamy) বাধ্যতামূলক করা হয়, যার ফলে নারীর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে 'জাতের প্রবেশদ্বার' (gateway to caste) হিসেবে দেখা হয়। ফলে, প্রান্তিক নারীরা একদিকে লিঙ্গভিত্তিক, অন্যদিকে জাতভিত্তিক–এই দ্বিমুখী শোষণের শিকার হন।

চতুর্থত, পিয়ের বোর্দোর 'সাংস্কৃতিক মূলধন' (Cultural Capital) তত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষা, ভাষা এবং সামাজিক দক্ষতা একজন ব্যক্তির সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রান্তিক পরিবারে অর্থনৈতিক সম্পদ কম থাকলেও, যদি পরিবারের নারী শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন এবং সেই মূল্যবোধ সন্তানদের মধ্যে সঞ্চার করেন, তবে তা সাংস্কৃতিক মূলধন হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়া প্রজন্মান্তরে সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) তৈরি করতে সহায়তা করে।

সবশেষে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের 'সাব-অল্টার্ন এজেন্সি' (Subaltern Agency) ধারণা প্রান্তিক নারীদের বর্তমান পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন– "নিম্নবর্গ কি কথা বলতে পারে?"– এখানে আলোচিত হয়েছে যে শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর প্রায়ই ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে হারিয়ে যায়। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই নীরবতা ধীরে ধীরে ভাঙছে। প্রান্তিক নারীরা এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন এবং নিজেদের অধিকার নিজেরাই দাবি করছেন। এর মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে এক শক্তিশালী স্বতঃসক্রিয় ক্ষমতা বা নিজস্ব সক্ষমতার বিকাশ ঘটছে।

সব মিলিয়ে, প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি কোনো একক কারণের ফল নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। ইতিহাস, শিক্ষা, সামাজিক আন্দোলন এবং তাত্ত্বিক চেতনার সম্মিলিত প্রভাবে এই পরিবর্তন গড়ে উঠেছে। শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তাদের এমন এক অবস্থানে নিয়ে এসেছে, যেখানে তারা শুধু নিজেদের জীবন উন্নত করছেন না, বরং সমাজের গভীরে নিহিত বৈষম্যমূলক কাঠামোকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছেন।

এই পরিবর্তন ধীরগতির হলেও তা অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী–যা এক অর্থে একটি চলমান নীরব বিপ্লবের প্রতিফলন।

পারিবারিক ও সামাজিক অগ্রগতি:

প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি বোঝার জন্য তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে এই নারীরা জাতভিত্তিক বৈষম্য, লিঙ্গনির্ভর নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের এক জটিল বাস্তবতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। ফলে তাঁদের জীবনের সুযোগ, স্বাধীনতা এবং অংশগ্রহণ–সবই সীমিত ছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক সচেতনতার প্রসারের ফলে তাঁদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে। এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় যে, অনেক প্রান্তিক তপশিলী নারী পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁদের সচেতনতা বেড়েছে, এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাঁরা পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখছেন। এর ফলে পরিবারে তাঁদের মর্যাদা যেমন বাড়ছে, তেমনি তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়নও দৃঢ় হচ্ছে।

একইসঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁদের উপস্থিতি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে তাঁদের অংশগ্রহণ এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁরা এখন কেবল পর্যবেক্ষক নন, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষা ও গবেষণাও ইঙ্গিত দেয় যে, এই পরিবর্তনগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের অংশ। যদিও এই অগ্রগতি এখনও সর্বত্র সমানভাবে ঘটেনি এবং নানা সমস্যা রয়েছে, তবুও এটি প্রান্তিক তপশিলী নারীদের ক্ষমতায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রা।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই পরিবর্তনগুলো ধীরগতির হলেও তা গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ—যা ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করছে।

শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তি

শিক্ষা প্রান্তিক তপশিলী জাতিভুক্ত নারীদের জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এটি শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে যে নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, আজ তাঁদের মধ্যেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অংশগ্রহণ স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস)-এর (২০১৯-২১) তথ্য অনুযায়ী, তপশিলী জাতিভুক্ত নারীদের সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। একইভাবে, ভারতের জনগণনার তথ্যও দেখায় যে নারীদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতি ঘটছে, যদিও তা এখনও সামগ্রিক গড়ের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ইউনিফাইড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস (ইউডিআইএসই+) ২০২১-২২ অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের মোট ভর্তির হার ৯৫ শতাংশেরও বেশি। এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, বিশেষত প্রান্তিক ও তপশিলী জনগোষ্ঠীর মেয়েদের ক্ষেত্রে।

এই অগ্রগতির পেছনে সরকারি উদ্যোগগুলোর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তফশিলি জাতি (SC) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তি দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া সংরক্ষণ নীতিও উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রবেশের সুযোগ বাড়িয়েছে। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এসব উদ্যোগের ফলে বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে মেয়েদের স্কুলে টিকে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির ফলে অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং স্মার্টফোনের ব্যবহার বেড়েছে। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (NSSO) -এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকাতেও ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহারের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে প্রান্তিক পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা নতুন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তবে ডিজিটাল বিভাজন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ–বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের পার্থক্য স্পষ্ট।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মায়ের শিক্ষার প্রভাব। ইউনিসেফ (UNICEF)-এর এক গবেষণায় পরিস্ফুটিত হয়েছে, শিক্ষিত মায়ের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেশি এবং স্কুলছুটের হার প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ কম। একইভাবে, বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, নারীর শিক্ষা শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষাগত সাফল্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়নের পথ নয়; এটি একটি শক্তিশালী আন্তঃপ্রজন্মগত পরিবর্তনের মাধ্যম। প্রান্তিক তপশিলী নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁদের আত্মনির্ভরতা, সামাজিক মর্যাদা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এর মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের জীবনই বদলাচ্ছেন না, বরং এটি আরও সমতাভিত্তিক ও সচেতন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রান্তিক তপশিলী নারীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এটি শুধু আয় বৃদ্ধির বিষয় নয়; বরং তাদের সামাজিক মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পূর্বে অধিকাংশ নারী সম্পূর্ণভাবে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, এখন সেখানে তারা নিজেদের আয়ের মাধ্যমে একটি স্বাধীন অবস্থান তৈরি করতে পারছেন।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-Help Groups বা SHGs) এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এই গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে নারীরা একত্রিত হয়ে সঞ্চয় করেন, ঋণ গ্রহণ করেন এবং ছোট ছোট উদ্যোগ শুরু করার সুযোগ পান। পশ্চিমবঙ্গে আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ নারী এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮-৯ কোটিরও বেশি নারী SHG-র সঙ্গে যুক্ত, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি বড় নির্দেশক।

এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে নারীরা হাঁস-মুরগি পালন, দর্জির কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন আয়ের উৎস তৈরি করছেন। ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ধরনের কার্যক্রম নারীদের গড় আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার মাধ্যমে বহু নারীর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer) ব্যবস্থার ফলে সরকারি অনুদান সরাসরি সেই অ্যাকাউন্টে পৌঁছাচ্ছে, যা নারীদের অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের (Global Findex Database০) ২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৭৭% প্রাপ্তবয়স্ক নারী এখন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় এসেছেন–যা আর্থিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)। এই কর্মসূচির অধীনে বহু ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশেরও বেশি। ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কিছু রাজ্যে এই অংশগ্রহণ ৫৫-৬০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক দৃশ্যমানতা উভয়ই বৃদ্ধি করেছে।

অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়ার ফলে নারীরা এখন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত– যেমন সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং দৈনন্দিন ব্যয়ের বিষয়ে–সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন গবেষণায় মাধ্যমে দেখা যাছে, নারীর আয় বাড়লে পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণও উন্নত হয়। এর ফলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

সবশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা কেবল আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রান্তিক তপশিলী নারীদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক স্বীকৃতি এবং লিঙ্গসমতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের জীবন নয়, বরং পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

সামাজিক সচেতনতা ও নেতৃত্ব

প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচক হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে যেসব নারীরা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে ছিলেন, তারা আজ ধীরে ধীরে সেই পরিসরে নিজেদের জায়গা তৈরি করছেন।

১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীদের জন্য ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত হওয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৪ লক্ষেরও বেশি নারী পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব নির্দেশ করে।

প্রথমদিকে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা 'প্রক্সি প্রতিনিধি' হিসেবে কাজ করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সক্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর বিভিন্ন সমীক্ষা দেখায় যে, নারী প্রতিনিধিরা এখন গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এর ফলে তাঁদের নেতৃত্বের গুণাবলি আরও দৃঢ় হচ্ছে।

এছাড়া ন্যাশনাল রুরাল লিভলিহুড মিশনের (NRLM) আওতায় গড়ে ওঠা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs), বিভিন্ন মহিলা সমিতি এবং স্থানীয় সংগঠন নারীদের একত্রিত হওয়ার একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (NSSO) এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ অঞ্চলে SHG-সংযুক্ত নারীদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

এই সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীরা এখন নিজেদের সমস্যাগুলো– যেমন বাল্যবিবাহ, গার্হস্থ্য হিংসা, মজুরি বৈষম্য এবং জাতভিত্তিক বৈষম্য–নিয়ে কথা বলতে এবং প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারছেন। ইউএন উইমেন এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংগঠিত নারী গোষ্ঠীগুলো লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং আইনি সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারও এই পরিবর্তনকে আরও গতিশীল করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ফলে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রসার ঘটেছে, যা নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি এবং যোগাযোগের সুযোগ বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে নারীদের ইন্টারনেট ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ডিজিটাল বিভাজন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তবুও এই পরিবর্তন নারীদের সামাজিক অংশগ্রহণকে আরও সহজ করে তুলছে।

সব মিলিয়ে দেখা যায়, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক সচেতনতা–এই তিনটি উপাদান প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। সরকারি নীতি, সামাজিক উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সম্মিলিত প্রভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

আজকের প্রান্তিক নারী আর কেবল সমাজের প্রান্তে থাকা একটি নীরব সত্তা নন; বরং তিনি ক্রমশ পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠছেন। তাঁদের এই অগ্রগতি এক ধরনের 'নীরব বিপ্লব' -এর সূচনা করেছে, যা ভবিষ্যতে আরও সমতাভিত্তিক, ন্যায়সংগত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও প্রান্তিক নারীর অগ্রগতি

প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষক পরিবারের নারীদের জীবনে স্থায়ী আয়ের অভাব একটি বড় সমস্যা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অনেক নারী স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self-Help Groups) সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনে পরিবর্তনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। এই গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে হাঁস-মুরগি পালন, সেলাইয়ের কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং অন্যান্য আয়ের উৎস তৈরি করতে শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্যোগগুলো তাদের আয়ের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে এবং পরিবারে একটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়। এর ফলে তারা শুধু উপার্জনকারী নন, বরং পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম হন।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নারীরা কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হচ্ছেন না; বরং তাঁদের সামাজিক অবস্থানেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। তারা এখন সন্তানদের শিক্ষার খরচ বহন করতে পারছেন, পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় পরিচালনায় অংশ নিচ্ছেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতা দুটিই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০ কোটির বেশি নারী ৯১ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত আছেন। এই গোষ্ঠীগুলো এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে।

এই প্রেক্ষাপটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়–

- নারীরা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অবদান রাখতে পারছেন।
- সন্তানের শিক্ষা ও দৈনন্দিন ব্যয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।
- পরিবার ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করছেন।

সবশেষে বলা যায়, এই ধরনের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ শুধুমাত্র আয়ের উৎস তৈরি করে না; বরং এটি নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আত্মবিশ্বাস এবং পরিবারে প্রভাব বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম। এই প্রক্রিয়া প্রান্তিক নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষা ও আন্তঃপ্রজন্মগত পরিবর্তন

শিক্ষা প্রান্তিক নারীদের অগ্রগতির একটি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি গড়ে তুলে। বিভিন্ন সমীক্ষায় পরিস্ফুটিত হয়েছে যে মাতৃশিক্ষা শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নারীর শিক্ষা বাড়লে সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত ফলাফলও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। শিক্ষা বৃদ্ধির ফলে শিশুদের মৃত্যু কমে যায় এবং অন্যান্য

শিক্ষা-সংক্রান্ত সুফল তৈরি হয়। মাতৃশিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা স্বাস্থ্যকর আচরণ, টিকাদান ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সক্রিয় হয়, এতে সুস্থতার পাশাপাশি স্কুলে উপস্থিতি ও পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ে। মাতৃশিক্ষা বৃদ্ধির ফলে শিশুদের স্কুলে থাকা এবং পড়াশোনায় প্রবৃদ্ধি বেশি হয়, বিশেষত যখন মা যতটা বেশি শিক্ষা পায়, সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে তার ভূমিকা শক্তিশালী হয়।

বাংলাদেশ, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের মতো দক্ষিণ এশিয়ার প্রান্তিক এলাকায় বিভিন্ন সমীক্ষায় ফুটে উঠবে যে, মা যদি শিক্ষিত হন বা নিজেরাই শিক্ষা-সম্পর্কিত উদ্যোগে যুক্ত হন, তাহলে তাদের সন্তানরা উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত পড়াশোনায় অগ্রগতি ঘটে এবং স্কুলছুটের হার কমে যায়। এর পেছনে কারণ হলো মা শিক্ষিত হলে শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে এবং তাদের শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন সামাজিক ও বাণিজ্যিক সমীক্ষায় আলোকিত হয়েছে যে, মায়ের প্রতি বছরের শিক্ষার বৃদ্ধি শিশুর জীবনে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যেমন উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং বৃদ্ধমান সামর্থ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করে না— এটি এক প্রজন্মের ত্যাগ ও সচেতনতার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের উন্নতির পথ তৈরি করে, যা সমাজে ধীরে ধীরে এক নতুন সচেতন ও শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়াটিকেই আন্তঃপ্রজন্মগত পরিবর্তন বলা হয়, যেখানে একটি প্রজন্মের উন্নয়ন সহজেই পরবর্তী প্রজন্মের উন্নয়নকে প্রসারিত করে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। বিশেষ করে ভারতীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষণ নীতির কারণে গ্রামীণ স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালের ন্যাশনাল পঞ্চায়েত সার্ভে অনুসারে, গ্রামীণ পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০%–৪৫% পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকায়, নারীরা স্থানীয় প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা কেবল নামমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রশাসনিক ও আইনগত কাজ পরিচালনা করতে শিখেছেন। বর্তমানে তারা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রামে আনতে এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ নিতে সক্ষম হচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলা প্রধানরা শিশু শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্প পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে তারা অন্য নারীদের সচেতন করছেন, তাদের ভোটাধিকার ও স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন পাচ্ছেন না, বরং গ্রামীণ সমাজে লিঙ্গ সমতার ধারণা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ন্যায়ের সূচকও বাড়াচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যে নারীদের নেতৃত্বে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, নারী নেতৃত্বে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে জল ও শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধা ২০-৩০% বেশি কার্যকরভাবে বিতরণ হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব গঠন এবং সমাজে লিঙ্গ সমতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংরক্ষণ নীতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করছে।

পরিসংখ্যানগত চিত্র

বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রান্তিক নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ধীরে হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষভাবে, জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি রিপোর্টগুলো এই পরিবর্তনগুলোকে পরিসংখ্যান সহ উল্লেখিত।

শিক্ষার হার

২০১৯-২১ সালে পরিচালিত জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ অনুসারে তপশিলী জাতিভুক্ত নারীদের সাক্ষরতার হার বর্তমানে প্রায় ৫৯-৬৫%। যদিও অঞ্চলভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৬২-৬৫% এর মধ্যে, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে ৫৯-৬১%। এই তথ্য প্রমাণ করে যে প্রান্তিক নারীরা শিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে ধীরে হলেও উন্নতি করছে।

বিবাহের বয়স

বিবাহের গড় বয়স পূর্বে প্রান্তিক নারীদের মধ্যে প্রায় ১৮.৫ বছর হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ক্ষেত্রে ২০ বছরের বেশি। শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সচেতনতার কারণে নারীরা স্বল্প বয়সে বিবাহের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হচ্ছেন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প এবং প্রত্যক্ষ হস্তান্তর ব্যবস্থার কারণে প্রান্তিক নারীদের প্রায় ৭৫% এর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক, কারণ নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকার ফলে সরকারি সুবিধা, বেতন ও ক্ষুদ্রঋণ সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

কর্মসংস্থান

গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, বিশেষ করে MGNREGA, নারীদের অর্থনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন জেলায় নারীরা মোট কর্মদিনের প্রায় ৪০-৫০% কাজ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে তারা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

এই পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, শিক্ষা, সামাজিক নীতি এবং সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যা প্রমাণ করে যে প্রান্তিক নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ধীরে হলেও ধ্রুবভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর।

সামাজিক অগ্রগতি সারণী

ক্ষেত্র	অতীত অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	চালিকাশক্তি
শিক্ষা	কেবল প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ	উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা	সরকারি বৃত্তি, সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা
অর্থনীতি	পুরুষের হাতে অর্থ নিয়ন্ত্রণ	নিজস্ব সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসা	স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ঋণ
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণে মান্যতা কম	সন্তান ও ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি	আয় ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি

সামাজিক পরিচয়	'নিচুজাত' হিসেবে পরিচিতি	শিক্ষিত মা, কর্মজীবী নারী বা পঞ্চায়েত সদস্য গুরুত্ব বৃদ্ধি	সাংবিধানিক অধিকার ও সামাজিক সচেতনতা

এই সারণীটি দেখায়, কীভাবে প্রান্তিক নারীদের জীবনধারা অতীতের সীমাবদ্ধতা থেকে বর্তমানের অগ্রগতির দিকে এগিয়েছে।

উপরের বাস্তব উদাহরণ ও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি কেবল তাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটছে। শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তাঁদের জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে।

এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও প্রভাব ফেলছে। তাই বলা যায়, প্রান্তিক নারীদের এই অগ্রগতি একটি ধীর কিন্তু শক্তিশালী সামাজিক রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে, যা ভবিষ্যতে আরও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

অগ্রগতির পথে অন্তরায়

প্রান্তিক তপশিলী নারীদের জীবনে শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও, তাঁদের সামনে এখনও একাধিক বাধা রয়ে গেছে। এই বাধাগুলো কাঠামোগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক– তিন ক্ষেত্রেই বিস্তৃত, যা তাঁদের পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কাঠামোগত বৈষম্য

ভারতীয় সমাজে জাতপাতের বৈষম্য এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি। তপশিলী নারীরা অনেক ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ বৈষম্যের শিকার হন। অনেক সময় তাঁদের কাজের মূল্যায়ন কম করা হয় এবং সমান সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্যের এই যৌথ প্রভাব তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদিও সংবিধান এবং বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে সমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার পূর্ণ প্রয়োগ এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে।

শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও বিদ্যালয় ত্যাগ

যদিও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও অনেক প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার এখনও একটি বড় সমস্যা। দারিদ্র্য, পারিবারিক চাপ, বাল্যবিবাহ এবং গৃহস্থালির কাজের কারণে অনেক মেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। মাধ্যমিক স্তরের পর মেয়েদের স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে তাঁদের উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা

যদিও স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় হচ্ছেন, তবুও তাঁদের আয় অনেক ক্ষেত্রে অস্থায়ী ও সীমিত। ক্ষুদ্র ব্যবসা বা দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজ দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল আয় নিশ্চিত করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ঋণ গ্রহণ করলেও বাজারে প্রবেশ, পণ্য বিক্রি এবং সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে সেই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তথ্যপ্রযুক্তিগত বঞ্চনা

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রযুক্তি শিক্ষা, তথ্যপ্রাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সুযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রান্তিক তপশিলী নারীদের একটি বড় অংশ এখনও এই প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার অভাব তাঁদের পিছিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতার অভাব একটি কঠিন সমস্যা। এর ফলে সরকারি তথ্য, অনলাইন পরিষেবা এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যা

প্রান্তিক নারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাব তাঁদের কর্মক্ষমতা ও জীবনের মানকে প্রভাবিত করে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে, গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীদের একটি বড় অংশ এখনও পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। এর ফলে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারেন না এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সম্পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন না।

সামাজিক কুসংস্কার ও মানসিক বাধা

প্রান্তিক নারীদের অগ্রগতির পথে সামাজিক কুসংস্কার ও পুরনো মানসিকতা একটি বড় বাধা। অনেক পরিবারে এখনও মেয়েদের বাইরে কাজ করা বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণকে ভালো চোখে দেখা হয় না। এছাড়া, গার্হস্থ্য হিংসা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাব তাঁদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি সত্ত্বেও তাঁদের সামনে এখনও বহুস্তরীয় সমস্যা বিদ্যমান। এই সমস্যা কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কার্যকর সরকারি নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা।

তবে এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও প্রান্তিক নারীরা যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছেন, তা একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে। সঠিক সহায়তা ও সুযোগ পেলে তাঁরা সমাজের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

উপসংহার

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি ধীরগতিসম্পন্ন হলেও তা এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক রূপান্তরের প্রতিফলন। ঐতিহাসিকভাবে জাত, লিঙ্গ ও শ্রেণিগত বৈষম্যের সম্মিলিত প্রভাবে তাঁদের জীবন নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ তাঁদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

শিক্ষা তাঁদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্তগ্রহণের সক্ষমতা বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তাঁদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি করছে এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান সুদৃঢ় করতে সহায়তা করছে। একই সঙ্গে, সামাজিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তাঁদেরকে সমাজের সক্রিয় পরিবর্তনকারী শক্তিতে পরিণত করছে। এই তিনটি উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে এক আন্তঃপ্রজন্মগত পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা যথার্থ অর্থেই এক ধরনের “নীরব বিপ্লব” হিসেবে বিবেচ্য।

তথাপি, এই অগ্রগতির পরেও কাঠামোগত বৈষম্য, শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, তথ্যপ্রযুক্তিগত বঞ্চনা, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক কুসংস্কার তাঁদের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় রূপে বিরাজমান। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন কার্যকর রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক সচেতনতার বিস্তার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সমন্বিত প্রয়াস।

সুতরাং, বলা যায় যে প্রান্তিক তপশিলী নারীদের অগ্রগতি কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়নের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের সূচক, যা ভবিষ্যতে ন্যায়ভিত্তিক, সমতাপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁদের এই অগ্রযাত্রাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুসংহত করতে রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

1. Ambedkar, B. R. (2014). Annihilation of caste: The annotated critical edition (S. Anand, Ed.). Navayana. (Original work published 1936)
2. Ambedkar, B. R. (1948). The untouchables: Who were they and why they became untouchables? Amrit Book Company.
3. Omvedt, G. (1995). Dalit visions: The anti-caste movement and the construction of an Indian identity. Orient Longman.
4. Chakravarti, U. (2003). Gendering caste: Through a feminist lens. Stree.
5. Rege, S. (2006). Writing caste, writing gender: Reading Dalit women's testimonios. Zubaan.
6. Pierre Bourdieu. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood.
7. Kimberlé Crenshaw. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
8. Gayatri Chakravorty Spivak. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271–313). University of Illinois Press.
9. Ministry of Rural Development. (n.d.). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Government of India. Retrieved March 28, 2026, from https://nrega.nic.in/
10. Government of West Bengal. (2022). Anandadhara (State Rural Livelihood Mission) reports. Government of West Bengal. Retrieved March 28, 2026, from https://anandadhara.wb.gov.in/
11. Testbook. (n.d.). According to the National Family Health Survey... Testbook. Retrieved March 28, 2026, from https://testbook.com/question-answer/according-to-the-national-family-health-survey-20--68e9080dc810a6fa5e450104
12. Apparaya, S. (2015). Scheduled caste women empowerment through self-help groups. International Journal of Scientific Research, 4(5). Retrieved from https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/article/scheduled-caste-women-empowerment-through-selfandndash-help-groups/NTQ1MA==/

13. Singh, P. (2025). A study of family balance and financial status of scheduled caste working women (With special reference to Godda district of Jharkhand). International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 13(7). Retrieved from https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2507599.pdf
14. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, & International Institute for Population Sciences (IIPS). (2022). National Family Health Survey-5 (NFHS-5): India districts factsheet data (provisional). Open Government Data Platform India. Retrieved from https://www.data.gov.in/catalog/national-family-health-survey-5-nfhs-5-india-districts-factsheet-data-provisional
15. IndJST. (2022). Self-Help Group and Socio-Economic Empowerment of Women in Rural India. Retrieved from https://indjst.org/articles/self-help-group-and-socio-economic-empowerment-of-women-in-rural-india
16. ResearchGate. (2023). Impact of Self-Help Group on Women Empowerment in India. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/367168084_IMPACT_OF_SELF_HELP_GROUP_ON_WOMEN_EMPOWERMENT_IN_INDIA
17. Times of India. (2023, March 12). SHGs help around 3 lakh women become self-reliant. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/varanasi/shgs-help-around-3-lakh-women-become-self-reliant/articleshow/129352523.cms
18. SpringerOpen. (2024). Women Empowerment through SHGs: A Study in Indian Context. Retrieved from https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-024-00419-y
19. Glewwe, P., & Muralidharan, K. (2019). Evidence for causal links between education and maternal and child health: A systematic review. PubMed Central (PMC6519047). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6519047/?utm_source=chatgpt.com
20. UNESCO. (2022). Education’s role in health and well-being: How women’s schooling reduces child mortality and improves child health outcomes. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/health-education/need-know?utm_source=chatgpt.com
21. Scispace. (2023). Impact of mother’s education on children’s educational outcomes. Retrieved from https://scispace.com/papers/the-impact-of-mother-s-education-on-children-s-educational-8nou1g5tcp?utm_source=chatgpt.com
22. Baird, S., Ferreira, F. H. G., Özler, B., & Woolcock, M. (2019). Causal effects of maternal schooling on child survival: Evidence from a quasi-experiment in Malawi and Uganda. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/336344571_The_Causal_Effect_of_Maternal_Education_on_Child_Mortality_Evidence_From_a_Quasi-Experiment_in_Malawi_and_Uganda?utm_source=chatgpt.com
23. Ministry of Panchayati Raj. (2020). National Panchayat Survey Report. Retrieved from https://www.panchayat.gov.in

24. UN Women. (2021). Women in local governance: Empowerment and leadership in rural India. Retrieved from https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021
25. World Bank. (2020). Gender and Governance: Women's Participation in Local Development. Washington, DC: World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/782761593593698078/gender-and-governance-womens-participation-in-local-development
26. Next IAS. (2026, February 3). DAY-NRLM: Next phase of rural women's empowerment. https://www.nextias.com/ca/current-affairs/03-02-2026/day-nrlm-women-empowerment